Psycho-education on Autism

অটিজম এমন একটি রোগ যার কিছু লক্ষণ সারা জীবন ধরে চলতে থাকে, কিছু কিছু শারীরিক রোগ রয়েছে যেমন: ডায়বেটিস এর লক্ষণ গুলোও সারা জীবন ধরে দেখা যায়। সাধারণত অটিজম জন্মের পর থেকে ৩ বছর বয়সের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।এর ফলে মূল যে সমস্যাগুলো দেখা যায় তা হলো-অন্যের সাথে যোগাযোগে সমস্যা, সামাজিক ভাবে সম্পর্ক তৈরী করতে সমস্যা, ভাষার বিকাশ কম হওয়া, কোন বস্তুর প্রতি অনাবশ্যক আগ্রহ এবং পুনরাবৃত্তি মূলক আচরন। অটিজম মৃদু থেকে তীব্র মাত্রার হতে পারে এবং এর লক্ষণগুলো এক এক শিশুর মধ্যে এক এক রকম ভাবে দেখা যায়।

লক্ষন:

অটিস্টিক শিশুদের দ্রুত চিহ্নিত করাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণায় দেখা গেছে ২০ থেকে ৩৬ মাসের শিশুর মধ্যে এমন কিছু লক্ষণ দেখা যায় যা দেখে সহজেই শিশুকে সনাক্ত করা যায়। লক্ষণগুলো হলো:

- প্রথম ১২ মাসের মধ্যে শিশু আধো আধো ভাবে কোন কথা বলে না।
- কোন ইশারা/ ঈঙ্গিত করে না (আঙ্গুল দিয়েকোন কিছু দেখানো, হাত নেড়ে টাটা বাই বাই করা ইত্যাদি)।
- প্রথম ১৬ মাসের মধ্যে একটি করে শব্দ বলার চেষ্টা করে না।
- ২৪ মাসের মধ্যে দুটি শব্দ দিয়ে (শুধু অনুকরণ করে নয়) নিজের থেকে স্বত:স্ফুর্তভাবে কথা বলে না।
- ৩ বছর বয়সের মধ্যে শিশুর বিকাশের বিভিন্ন দক্ষতাগুলি ধীরে ধীরে কমে যেতে থাকে । যেমন: নাম ধরে ডাকলে ফিরে তাকানো, হাসি দেওয়া, কথা বলা ইত্যাদি।
- জেদী আচরন করে এবং অতিমাত্রায় চঞ্চলতা দেখা যায়।

স্বাভাবিক শিশুদের কারও মধ্যে এসব লক্ষনের কোন ১/২ টি দেখা যেতে পারে।তবে যদি কোন শিশুর মধ্যে এইসব বেশির ভাগ লক্ষণ দেখা যায়, তাহলে কোন রকম দেরি না করে চিকিৎসক বা সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

অটিজম এর শিশুর বৈশিষ্ট্য ঃ

শিশুর অটিজম হয়েছে কিনা তা সঠিক ভাবে বলতে পারেন একজন মনোচিকিৎসক, সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ, চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষক । নিম্নলিখিত বৈশিষ্টের মাধ্যমে অটিজম এর শিশুদের চিহ্নিত করা যায় :

১। সামাজিক আচরণের ধরন:

স্বাভাবিক ভাবে বেড়ে ওঠা শিশুরা জন্মের পর থেকেই বিভিন্ন ধরনের সাধারণ সামাজিক আচরণ করতে শুরু করে যেমন: নাম ধরে ডাকলে ফিরে তাকায়,আদর করলে হাসে, সমবয়সী শিশুর সাথে খেলা করে ইত্যাদি।অন্যদিকে অধিকাংশ অটিজম এর শিশুদের মধ্যে স্বাভাবিক সামাজিক আচরণগুলো করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা যায়। যেমন:

১. নাম ধরে ডাকলে ফিরে তাকায় না।
২. সমবয়সী শিশুর সাথে বন্ধুত্ব তৈরী করতে পারে না। যেমন:একই সাথে খেলা করা,গল্প করা ইত্যাদি।
৩. মানুষের দিকে চোখ তুলে তাকায় না।
৪. প্রায়ই অন্যরা আদর করলে কিংবা জড়িয়ে ধরলে পছন্দ করে না বা ভালো বোধ করে না।
৫. কল্পনামূলক বা অভিনয় মূলক খেলা খেলে না, যেমন:পুতুলের বিয়ে দেওয়া,যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা ইত্যাদি।
৬. অন্যের চিন্তা ও অনুভূতি বুঝতে শেখে ধীরে ধীরে, আবার অনেকে এটা বুঝতেও পারে না।
৭. বিভিন্ন ধরণের সামাজিক পরিবেশে খাপ খাওয়াতে পারে না।যেমন:বিয়ের অনুষ্ঠান বা জন্মদিনের অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত কান্নাকাটি করা, জেদ করা ইত্যাদি।

খুবই সাধারণ সামাজিক বিষয়গুলি যেমন: হাসি, তামাশা, চোখের ইশারা, ভাব-ভঙ্গি বা ভেংচি কাটা ইত্যাদি তাদের কাছে অর্থহীন হয়ে থাকে। এ কারণে তারা একই শব্দের বা বাক্যের বিভিন্ন অর্থ ধরতে পারে না, যেমন: ওদের কাছে "চুপ করো" কথাটি সব সময় একই অর্থ বহন করে, এটা হাসি হাসি মুখে বলা হোক বা রাগের ভঙ্গিতে বলা হোক, তাতে কিছু পার্থক্য হয় না।

২। ভাষার বিকাশ:

স্বাভাবিক শিশুরা তিন বছর বয়সের মধ্যেই ভালোভাবে কথা বলতে শুরু করে। গবেষণায় দেখা গেছে, অর্ধেকেরও বেশি অটিজম এর শিশুরা তাদের সম্পূর্ণ জীবন জুড়েই কোন কথা বলে না।আর যেসব শিশুর মধ্যে প্রথমে অটিজমের লক্ষণ দেখা যায় না, সেসব শিশু ৩ বছর বয়সের মধ্যে বিভিন্ন ভাবে আধো আধো ভাবে কথা বলা শুরু করে, কিন্তু তারপর হঠাৎ করে কথা বলা বন্ধ করে দেয়। আবার অনেক শিশু কথা বলে অনেক দেরিতে, প্রায় ৫-৮ বছর বয়সের পর গিয়েও কথা বলতে দেখা যায়।

যেসব শিশুরা কথা বলে তাদের মধ্যে অনেককে ভাষা কিংবা শব্দ ব্যবহারেও বেশ অস্বাভাবিকতা দেখা যায়। কেউ কেউ যথাযথ শব্দ জুড়তে পারে না, ফলে বাক্য অর্থহীন হয়ে পড়ে যা পরিবারের সদস্য ছাড়া অন্যরা বুঝতে পারে না।

- কিছু শিশু বিভিন্ন পরিস্থিতিতে হয়তো সারাদিন একই ধরনের বাক্য ব্যবহার করে। যেমন: "গাড়িতে ওঠ", "এখানে বস" ইত্যাদি।
- আবার ভাষার দক্ষতা ভালো ভাবে থাকার পরও অনেক শিশু বেশি সময় কথা চালিয়ে যেতে পারে না।
- সাধারণ মানুষ আনন্দময় কথা বলতে গিয়ে হাসে বা বিভিন্ন ধরনের মুখভঙ্গি করে। কিন্তু এই শিশুদের মুখভঙ্গি, দেহভঙ্গি, চলাফেরার সাথে এদের সচরাচর কোন মিল থাকে না। ওদের কণ্ঠস্বরেও মনের অনুভূতি যথাযথ ভাবে প্রকাশ পায় না।
- এসব শিশুদের অনেকেই যথাযথভাবে ভাষা ব্যবহার করতে পারে না। তাই তাদের মনের অনুভূতি ও চাহিদা অন্যের কাছে ঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারে না, ফলে অনেক সময় প্রত্যাশিত কোন জিনিস পাবার জন্য তারা জেদী আচরন করা শুরু করে।

এই সমস্যাগুলি দূর করার জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ। যথাযথ প্রশিক্ষণ না পেলে এসব শিশু হয়তো সারা জীবন এটুকুই ভাষা ব্যবহার করবে।

৩। একই আচরন বারবার করা :

- কোন বস্তুর প্রতি অনাবশ্যক গভীর মনোযোগ দেয়া বা অস্বাভাবিক আগ্রহ দেখানো।যেমন: সুতা,চামচ,কাঠি,গাড়ি ইত্যাদি নিজের হাতের মধ্যে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে রাখা।
- কোন রুটিন কাজ বা পরিবেশের কোন পরিবর্তন করতে চাইলে সহজে মেনে না নেওয়া। অর্থাৎ সব সময় আশেপাশের জিনিস একই রকম ভাবে থাকতে হবে। যেমন: ঘরের কোন জিনিস পত্র সরানো হলে কান্নাকাটি শুরু করা।
- খেলনা বা জিনিস পত্র সারিবদ্ধভাবে সাজিয়ে রাখা ।
- বিভিন্ন ধরনের শারিরীক অঙ্গভঙ্গি বার বার করা। যেমন: আঙ্গুল মটকানো, হাত ঘষা, সারা শরীর মচকানো ইত্যাদি।
- সাধারণ কোন কাজের সঙ্গে বেশিক্ষণ মনোযোগ না দেয়া।

৪। উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দেওয়া :

- কোন কোন উদ্দীপকের প্রতি (যেমন: শব্দ, দেখা, স্পর্শ, স্বাদ, গন্ধ, এর প্রতি) অতিমাত্রায় প্রতিক্রিয়া করা। যেমনঃ কেউ কেউ টিভির শব্দ শুনলে বা কল দিয়ে পানি পড়ার শব্দে হয়তো কানে হাত দিয়ে রাখবে অথবা কেউ ঐ শব্দ কোথায় হচ্ছে তা খুজতে থাকবে। আবার কেউ কেউ এই শব্দ বারবার শুনতে চাইবে।

- কোন ব্যথা বা যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতির প্রতি কম প্রতিক্রিয়া করা/অনুভূতি কম হওয়া।যেমনঃ শরীরের কোথাও কেটে গেলে বা পুড়ে গেলে সহজে ব্যথা প্রকাশ করে না।
- নিজেকে আঘাত করার প্রবণতা। যেমন: হাত কামড়ানো, দেয়ালে মাথা ঠুকা ইত্যাদি।

উপরোক্ত লক্ষণগুলো প্রধানত অটিজম হওয়ার পর শিশুর মধ্যে দেখা যায়।তবে এই লক্ষণগুলো এক এক শিশুর ক্ষেত্রে এক এক রকম হতে পারে , কারও মধ্যে বেশী মাত্রায় এবং কারও মধ্যে কম মাত্রায় দেখা যেতে পারে।

অটিজম প্রতিবন্ধকতা কেন হয়?

গবেষণায় দেখা গেছে যে, মস্তিষ্কের গঠন বা মস্তিষ্কের কার্যপ্রণালীর অস্বাভাবিকতাই অটিজম হওয়ার কারণ। কিন্তু এই অস্বাভাবিকতা কেন হয় এর সুনির্দিষ্ট কোন কারণ জানা যায় নাই। তবে জন্মের পর কোন কারণে এটি সৃষ্টি হয় না। নিচে কিছু কারণ উল্লেখ করা হলো-

১. জন্মের সময় শিশুর দেহের ক্রমোজমের কোনটিতে সমস্যা তৈরী হলে পরবর্তীতে তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের শারীরিক ও মানসিক সমস্যা দেখা দেয়। গবেষণায় দেখা গেছে যমজদের মধ্যে ভিন্ন যমজদের তুলনায় অভিন্ন যমজদের মধ্যে অটিজম হবার সম্ভাবনা বেশী থাকে (Kates WR. etal,2004)।

২. গর্ভকালীন সময়ে মা রুবেলা (একে জার্মান হামও বলা হয়) ভাইরাসে আক্রান্ত হলে, বিশেষ করে গর্ভের প্রথম ৩ মাসে, ঐ শিশুর পরবর্তী জীবনে বিভিন্ন সমস্যা তৈরী করতে পারে, যেমন: অটিজম আক্রান্ত হওয়া এবং মানসিক প্রতিবন্ধিতা ইত্যাদি।

৩. গর্ভকালীন সময়ে শিশুর অক্সিজেন সরবরাহ কম হলে অটিজম হবার ঝুঁকি বাড়তে পারে।

৪. গর্ভকালীন সময়ে মানুষের মস্তিষ্ক দ্রুত বড় ও জটিল হতে থাকে, এই সময়ে মস্তিষ্কের বিকাশ স্বাভাবিক ভাবে না হবার কারণে শিশুর ভাষা, সংবেদন, সামাজিক ও মানসিক বিকাশে সমস্যা তৈরী হয়।

৫. মস্তিষ্কে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক উপাদানের পরিমানের ত্রুটির জন্য মস্তিষ্কের নিউরোকেমিক্যাল উপাদানের ভারসাম্যহীনতা তৈরী হয় ফলে এই রোগের লক্ষণগুলি দেখা যেতে পারে।

৬. আরও কিছু কারণের কথা বলা হয়, যেমন: এম এম আর ভ্যাকসিন, খাবারে গ্লুটেন অথবা ক্যাসিন ইত্যাদি।

অটিজম কতোটুকু নিরাময়যোগ্যঃ

অটিজম এর নির্দিষ্ট কারণ কোনটি তা নিয়ে এখনও গবেষণা চলছে। তাই এখন পর্যন্ত এর জন্য নির্দিষ্ট কোন চিকিৎসা পদ্ধতি নেই, যেটার মাধ্যমে শিশু সম্পূর্ণ ভাবে ভালো হয়ে যাবে। পরিবারে প্রথম যখন

কোন শিশুর অটিজম হয়েছে বলে সনাক্তকরণ হয়, তখন যে সমস্যাটা দেখা যায় তা হচ্ছে বেশিরভাগ বাবা-মা এবং পরিবার এটা মেনে নিতে চায় না। বস্তুত অনেক সময় পরিবারের সদস্যরা এমন বলে যে, বয়স হলে ঠিক হয়ে যাবে, বাচ্চাদের মধ্যে এধরনের আচরণ থাকতেই পারে ইত্যাদি। এসব ধারণার মাধ্যমে বাবা-মা কেবলমাত্র নিজেদের মনকে শান্ত রাখার চেষ্টা করেন এবং ফলোশ্রুতিতে যা হয় :

i. শিশুর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ হয় না।
ii. শিশুর উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হয়।

তাই চিকিৎসা যত দেরীতে শুরু করবেন শিশুর পরিবর্তন ততই ধীর গতিতে হবে। অবশ্যই মনে রাখবেন শিশুর অবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ, রুটিন মাফিক কাজ করা এবং সময় ও ধৈর্য্যের সমন্বয়। এজন্য, প্রথম থেকেই যা দরকার তা হচ্ছে শিশুর বর্তমান পরিস্থিতিকে মেনে নেয়া এবং শিশুর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলো মূল্যায়ন করে তা উন্নয়নের পথ সুগম করা।

চিকিৎসা

যদিও অটিজম এর সমাধাণ সম্ভব নয় কিন্তু নিয়ন্ত্রন সম্ভব। এজন্য প্রয়োজন বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কৌশল আয়ত্ব করা। অটিজম সনাক্তকরণ এবং এর তীব্রতা বোঝার জন্য বিভিন্ন ধরনের মনোবৈজ্ঞানিক পরিমাপক ব্যবহার করা হয়, যেমনঃ ADOS(Autism Diagnostic Observation Schedule), ADCL(Autism Diagnostic Check List), PDD AS(Pervasive Developmental disorder Assessment Scale). এই পরিমাপকগুলো ঢাকা শিশু হাসপাতাল,শিশু ও মাতৃসদন হাসপাতাল,বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া এসব শিশুর জন্য বিভিন্ন ধরনের বিশেষ শিক্ষা এবং থেরাপি ব্যবহৃত হচ্ছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ

১. ঔষধ
২. সাধারণ শিক্ষা ও বিশেষ শিক্ষা
৩. মনোবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা (আচরন পরিমার্জন ও সাইকোএডুকেশন)
৪. Speech Terapy (স্পিচ থেরাপী)
৫. Occupational Therapy (অকুপেশনাল থেরাপী)
৬. Physio Therapy (ফিজিওথেরাপী)

১.ঔষধঃ কোন কোন শিশুর মধ্যে বেশ কিছু লক্ষণ দেখা যায় যেমনঃ আক্রমনাত্মক আচরণ, ভাংচুর,অস্থিরতা, অতিচঞ্চলতা, ঘুমের সমস্যা, মনোযোগ সমস্যা ইত্যাদি। এগুলো চিকিৎসার জন্য বেশ কিছু ঔষধ রয়েছে যা ব্যবহার করলে শিশুকে কিছুটা নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব, তবে এসব ঔষধের কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ও রয়েছে। শিশুকে যে লক্ষণগুলোর জন্য ঔষধ দেয়া হচ্ছে সেই লক্ষণগুলোর উন্নতি হচ্ছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখুন। শিশুকে কতদিন ঔষধ ব্যবহার করতে হবে এবং কখন ঔষধ ব্যবহার বন্ধ করতে হবে তা সঠিকভাবে বলতে পারেন একজন চিকিৎসক। তাই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া নিজ থেকে ঔষধ বন্ধ করবেন না।

২.সাধারণ ও বিশেষ শিক্ষাঃ শিশুর স্বাভাবিক বুদ্ধি থাকলে এবং কম মাত্রায় অটিজম থাকলে সাধারণ শিক্ষা লাভ করতে পারে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় সাধারণ স্কুল গুলোতে ভর্তি হলেও, পরবর্তীতে আচরনগত সমস্যা (চিৎকার করা, অতি চঞ্চলতা, জেদী আচরন ইত্যাদি) এবং জটিল বিষয়(অংক,বিজ্ঞান) বুঝতে না পারার কারণে, কিছুদিন যেতে না যেতেই এসব শিশু বাদ পড়ে যায়। এসব পরিস্থিতিতে শিশুর সমস্যা আরো বেড়ে যায়। এরূপ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের পরমার্শ নিয়ে শিশুকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী ১টি বিশেষ স্কুলে দিন। বিশেষ স্কুলে শিশুর যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী এবং শিশুর উপযোগী শিক্ষার উপকরণ ব্যবহার করে শিক্ষা দেয়া হয়। বিশেষ স্কুলে প্রতি জনে একজন করে (ওয়ান টু ওয়ান) বা খুব ছোট দল করে পর্যাপ্ত পরিমান প্রশিক্ষণ দেয়া হয় যাতে করে শিশুর নিজের শেখার চাহিদা পূরণ হয়।

এক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছেঃ

১. প্রতিদিন ৩-৫ ঘন্টা (সপ্তাহে ২০-৩০ ঘন্টা) সময় ধরে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা করুন। যেখানে শিশুকে শিক্ষা মূলক কাজকর্মে অংশগ্রহণ করাবেন এবং তাকে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করবেন (বাসা এবং স্কুল মিলিয়ে)।
২. রুটিন অনুযায়ী অনুশীলন/চর্চা করান।
৩. নিয়মিত অনুশীলন করান। কারণ অনুশীলন নিয়মিত না হলে ,নির্ভরযোগ্য ফলাফল পাওয়া যাবে না।

৩. মনোবৈজ্ঞানিক চিকিৎসাঃ মনোবিজ্ঞানীর নিকট আসার পর প্রথমে শিশুর সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য নেয়া হয় যেমনঃ শারীরিক, মানসিক, চিন্তাগত, পরিবেশ, বাসস্থান ইত্যাদি। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিশুর আচরনের প্রত্যাশিত পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা হয় এবং বাবা-মা কেও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

৪.স্পীচ থেরাপীঃ শ্রবণ সমস্যা, ভাষাগত সমস্যা এবং বাকপ্রতিবন্ধীতার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয় স্পীচ থেরাপীস্টরা। এক্ষেত্রে শিশু কি পরিমান কথা বলছে এবং তাদের অন্যের সাথে যোগাযোগ করার

জন্য ভাষার দক্ষতা কতটুকু রয়েছে তা মূল্যায়ন করে দেখা হয় এবং বিভিন্ন ধরনের কৌশল প্রয়োগ করা হয়।

৫. অকুপেশনাল থেরাপী ঃ যে সব শিশুরা কোন কোন উদ্দীপকের প্রতি অতিমাত্রায় প্রতিক্রিয়া করে এবং যাদের সূক্ষ্ম মাংসপেশীর দক্ষতার অভাব রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে অকুপেশনাল থেরাপী কার্যকরী।

৬. ফিজিওথেরাপী ঃ শিশুর বিভিন্ন ধরনের মাংসপেশীর দক্ষতার সমস্যা থাকলে (যেমনঃ সিড়িতে উঠানামা, হাঠা এবং বসায় অস্বাভাবিকতা ইত্যাদি) তা সমাধানের জন্য ফিজিওথেরাপিষ্টরা বিভিন্ন ধরনের কৌশল প্রয়োগ করেন।

মনোবিজ্ঞানী, অকুপেশনাল থেরাপীস্ট, স্পীচ থেরাপীষ্ট, ফিজিওথেরাপিষ্ট এদের মধ্যে যে কোন বিশেষজ্ঞের নিকট আসার পর প্রথমে শিশুর সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য নেয়া হয়। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে সমস্যার তালিকা তৈরী করা হয় এবং প্রতিটি সমস্যার বিপরীতে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নেয়া হয়।

শিশুকে সাহায্য করার কৌশল সমূহঃ

ক) কাজকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে ভাগ করাঃ অনেক ধরনের বিষয় রয়েছে যেগুলো আয়ত্ব করা এই শিশুদের জন্য কঠিন হয়ে যায়। এক্ষেত্রে শিশুর বয়স উপযোগী কি কি কাজ শেখা দরকার তা পরিকল্পনা করুন এবং সেই অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দিন। মৃদু থেকে তীব্র মাত্রার অটিজম এর সব বয়সী শিশুরাই এই পদ্ধতিতে উপকৃত হয়।

এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যঃ

- প্রতিটি কাজকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে ভাগ করুন।
- কোন একটি সম্পূর্ণ কাজের ক্ষুদ্র ১টি অংশ শেখান এবং আস্তে আস্তে শেখান।
- একটি কাজের কিছু অংশ সম্পূর্ণভাবে শেখা হলে পরবর্তী অংশ শেখান ।
- প্রয়োজন অনুযায়ী সাহায্য করুন এবং আস্তে আস্তে তা সরিয়ে নিন ।

শিশুর যতটুকু ক্ষমতা রয়েছে তার উপর ভিত্তি করে এই পদ্ধতি ব্যবহার করুন। যেমন: দাঁত ব্রাশ করার জন্য শিশুকে নিম্নোক্ত ভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া যায়:

১. প্রথমে ব্রাশ রাখার হোল্ডার থেকে ব্রাশ নেয়া
২. কল খোলা
৩. ব্রাশ ধোয়া
৪. কল বন্ধ করা
৫. টুথপেস্ট নেয়া
৬. পরিমান মতো টুথপোস্ট ব্রাশে লাগানো
৭. দাতে টুথব্রাশ দেয়া ও বিভিন্ন অংশে ঘষা
৮. বেসিনে টুথপেস্টের ফেনা ফেলা
৯. টুথব্রাশ ধোয়া
১০. পানি দিয়ে কুলি করা
১১. মুখ মোছার জন্য তোয়ালে নেয়া
১২. মুখ মোছা এবং তোয়ালে নির্দিষ্ট স্থানে রাখা

শিশুকে সাহায্য করার মাধ্যমে এই কাজ গুলো শেখানো যায়। এক্ষেত্রে প্রথম দিকের কাজ গুলোতে সাহায্য করুন এবং শেষের কাজটি শিশুকে নিজে নিজে করতে দিন। যেমন: "মুখ মোছার পর তোয়ালে নির্দিষ্ট স্থানে রাখা।"

আবার এটি বিপরীত ভাবেও করা যায়। এক্ষেত্রে প্রথম কাজটি শিশুকে নিজে নিজে করতে দিন,যেমন: "প্রথমে হোল্ডার থেকে ব্রাশ নেয়া" আর পরের কাজগুলোতে সাহায্য করুন। প্রতিটি কাজ শেষ করার পর পুরষ্কার দিন ও প্রশংসা করুন।

খ)<u>আচরণ ঘটার ধারাবহিকতা:</u> সাধারণত এই শিশুরা বিভিন্ন ধরনের জেদী আচরণ করে।যেমন: অতিরিক্ত চিৎকার, কান্নাকাটি, কোন কাজ থেকে উঠে যাওয়াা ইত্যাদি। এক্ষেত্রে প্রথম কাজ হলো কোন ধরনের পরিস্থিতিতে শিশু এ ধরনের আচরন করছে এবং আচরনের পরবর্তী ফলাফল কি হচ্ছে সেটা লক্ষ্য করা। এই আচরন ঘটার ধারাবাহিকতাকে ৩টি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন:

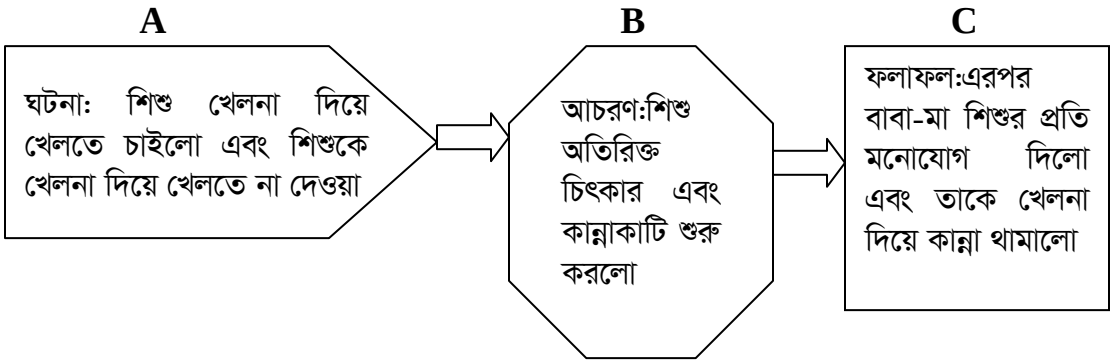

এক্ষেত্রে শিশু বুঝলো যদি সে জেদ করে তাহলে তাকে মনোযোগ দেয়া হবে,এটি তার জন্য এক ধরনের পুরষ্কার।এর ফলে, পরবর্তীতে শিশু কোন কিছু পাবার জন্য অথবা কোন কিছু করতে না চাইলে এই ধরনের আচরন বার বার করতে পারে।তাই এই ৩টি ধাপের এক বা একাধিক ধাপে পরিবর্তন এনে শিশুর আচরণ পরিবর্তন করা যায়।যেমন:

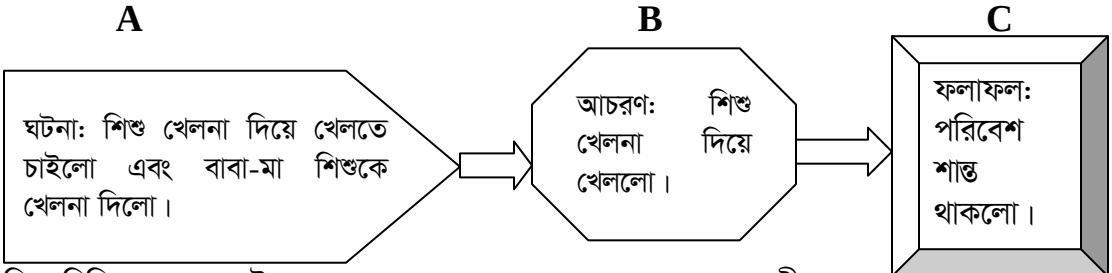

শিশু বিভিন্ন কারনে এই ধরনের আচরনগুলো করে। যেমন: একঘেয়েমী বোধ করলে, মনোযোগ পাবার জন্য, কঠিন কাজ করতে ভয় পেলে, পরিবেশ বিরক্তকর হলে ইত্যাদি। এমন অবস্থায়ঃ

১. যদি শিশু একঘেয়েমী বোধ করে বা পরিবেশটা বিরক্তিকর হয় তাহলে শিশুকে আনন্দদায়ক কোন কাজে যুক্ত করুন ।

২. যদি শিশু মনোযোগ চায় তাহলে যখন সে ভালো অনুভব করে এবং ভালো কাজ করে তখন তার প্রতি মনোযোগ দিন।

৩. আর কঠিন কাজকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবে ভাগ করে শেখান।

এভাবেই শিশুর অপ্রতাশিত আচরনের জন্য পর্যায়ক্রমে কয়েকদিন পর্যন্ত ৩টি ধাপে [ঘটনা- আচরন-ফলাফল] ছক তৈরী করলে বোঝা যাবে শিশুটি কেন এবং কিসের জন্য এই আচরন করছে। আচরন পরিবর্তনের জন্য শিশুকে সাহায্য করুন এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞকে এই অপ্রত্যাশিত আচরন ঘটার কারন উল্লেখ করে পরামর্শ নিন।

গ) দৈনন্দিন কার্যাবলী: শিশুর জন্য অবশ্যই দৈনন্দিন কার্যাবলীর একটি রুটিন তৈরী করুন। এমন ধরনের রুটিন তৈরী করুন যা শিশুকে অলস করে ফেলবে না আবার অতিরিক্ত চাপেও ফেলবে না। কোন কাজ শেখানোর ক্ষেত্রে তা ধীরে ধীরে শেখান। যেমন: জামার বোতাম লাগানো, খাওয়া, কোন কিছু চুষে খাওয়া ইত্যাদি। কাজগুলো সহজ থেকে শুরু করুন তারপর আস্তে আস্তে কঠিন এর দিকে যান। কাজ ঠিকভাবে করার জন্য অথবা কাজ ভুল হলে তা সংশোধন করার জন্যঃ

- অনুরোধ করুন বা নির্দেশনা দিন। যেমন: "চেয়ারে বস"।
- শিশুকে চিত্র দেখিয়ে কোন কিছু চিনতে সাহায্য করুন।
- শিশুর হাত ধরে (পূর্ণ সাহায্যে) কাজটি শিখতে সাহায্য করুন। যেমন: হাত ধরে জামার বোতাম লাগানো।
- যে বিষয়ে শিক্ষণ দেয়া হয় তার উপর জোর দিন। যেমন: "জামার বোতামের দিকে তাকাও" এর পরিবর্তে "বোতাম" শব্দটির উপর জোর দিন।
- নির্দেশনা সব সময় সুস্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত ও সহজ ভাবে দিন ।যেমন:"দুটি বল" মিল করতে বললে শুধুমাত্র "মিল কর" নির্দেশ দিন ।

এক্ষেত্রে শিশুকে সাহায্য করুন, তারপর সাহায্যের পরিমান ধীরে ধীরে কমিয়ে দিন এবং সেটা সম্পূর্ণ ভাবে সরিয়ে নিন । এর ফলে শিশু অন্যের সাহায্য ছাড়াই নিজে নিজে তার প্রয়োজন অনুযায়ী কাজ সম্পূর্ণ করতে পারবে। প্রতিটি কাজ শেষ করার পর পুরষ্কার দিন ও প্রশংসা করুন।

ঘ) পুরষ্কার এর ভূমিকা: শিশুর দৈনন্দিন কাজের উন্নতির জন্য পুরষ্কার ব্যবহার করা যায়। পুরষ্কার হলো এমন কিছু যা শিশু পছন্দ করে। যেমন: খাবার, মনোযোগ, প্রশংসা, বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, পছন্দের কিছু কিনে দেওয়া ইত্যাদি।

- কোন একটি কাজ করার পর যদি পুরষ্কার দেয়া হয় তাহলে শিশু আবার ঐ কাজটি করে। যেমন: অনেক শিশুর টয়লেট কিংবা দাত ব্রাশ কিভাবে করতে হয় তা বুঝতে পারে না। এ পর্যায়ে রুটিন অনুযায়ী শিশুর জন্য প্রশিক্ষণ শুরু করুন,তাহলে দেখা যাবে শিশুটি এক পর্যায়ে আচরণটি করছে এবং ঠিক যখন সঠিক আচরণটি শিশু করবে তখনই তাকে পুরষ্কার দিন।এক্ষেত্রে শিশুকে উৎসাহিত করুন যাতে সে বুঝতে পারে যে, সে একটি ভালো কাজ করেছে।
- সঠিক কাজটি করার সাথে সাথে পুরষ্কার দিন, তা না দিলে সেই কাজটি আবার করার সম্ভাবনা কমে যায়।
- যে আচরণটির জন্য পুরষ্কার দেয়া হল সে আচরনটি যেন শিশু আবার করে সে দিকে লক্ষ্য রাখুন। শিশু যে সব ছোট ছোট কাজ করতে পারে সেগুলোকে উৎসাহ দিন।
- কোন আচরন/কাজ শেখানোর ক্ষেত্রে প্রথমে পুরষ্কার খুব ঘন ঘন দিন। পরবর্তীতে কাজ শেখা হয়ে গেলে প্রতিবার তা দেবার দরকার নেই। এক্ষেত্রে মাঝে মাঝে পুরষ্কার দিন।
- প্রচুর পরিমানে পুরষ্কার দেয়া হলে তার চাহিদা শিশুর কাছে থাকে না। যেমন: প্রথমেই শিশু কে ৪/৫টি চকলেট না দিয়ে অল্প করে দিন। এতে শিশু পুরষ্কার পাবার জন্য আবার সঠিক আচরনটি করবে।
- শিশুকে বকা দেওয়া, মারধোর করাও কিছু শিশুর কাছে এক ধরনের পুরষ্কার। সেজন্য যদি শিশু বিরক্তিকর আচরন করে এবং যদি বাবা-মা ঐ আচরণের প্রতি মনোযোগ না দিয়ে এড়িয়ে যায় ,তাহলে শিশু আস্তে আস্তে ঐ আচরণ আর করবে না।

ঙ) অভিনয় করে দেখানো: সাধারণত কোন কাজ কিভাবে করতে হবে তা নিজে অভিনয় করে শিশুকে দেখিয়ে দিন।শিশুরা তার বাবা-মা/অন্যকে কোন কাজ যেভাবে করতে দেখে ঠিক সেভাবেই সে নিজে চেষ্ঠা করে, যেমন: কিভাবে পানির গ্লাস ধরতে হবে তা নিজে করে শিশুকে দেখিয়ে দেওয়া।

চ)পার্থক্যকরণ: শিশুকে যখন বিভিন্ন জিনিস চেনানো হয় এবং যখন শিশু অনেকগুলো বস্তুর মধ্য থেকে নির্দেশনা মতো কোন বস্তু চিহ্নিত করতে পারে ও তা তুলে আনতে পারে, তখন বুঝতে হবে শিশু পার্থক্যকরণ করতে শিখছে। যেমন: বল ও আপেল এর মধ্যে "বলটি আনো" বললে এক্ষেত্রে "বলটি" চিহ্নিত করা এবং তা নিয়ে দেখানো।এভাবে বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে পার্থক্যকরণ করতে শেখান এবং সেটা বার বার অভ্যাস করান।

ছ) বাধা দান করাঃ এই শিশুদের কোন বস্তু চিনতে শেখানোর পর যখন তাকে আরেকটি নতুন বস্তু চিনতে শেখানো হয় তখন তারা প্রায়ই ভুল করে। এক্ষেত্রে শিশুকে সঠিক বিষয়টি শেখানোর জন্য যখন কোন কাজ থেকে বিরত রাখা হয় , যেমন: শিশুকে পুরষ্কার দিয়ে "কলম" চেনানো হলো এবার একই ভাবে তাকে

"বই" চেনানো হলো। একটি বস্তু চেনার পর সে ঠিকভাবে দুটি বস্তু চিনতে পেরেছে কিনা তা জানার জন্য "বই ও কলম" পাশাপাশি রেখে শুধু "কলম" তুলে আনতে বলা হলো। যদি শিশু ঠিকমতো নির্দিষ্ট জিনিসটি তুলে আনতে পারে তাহলে বোঝা যাবে যে সে "বই ও কলম' দুটি বস্তুই চিনতে পারে। এক্ষেত্রে যদি সে ভুল করে "কলম" এর জায়াগায় "বই" তুলে নিয়ে আসে তাহলে বোঝা যাবে সে দুটি বস্তু আলাদা ভাবে চিনতে পারেনি, এক্ষেত্রে শিশু "কলম" না তুলে যখনই "বই" এর দিকে হাত দিবে তখন তাকে "বই" ধরার আগে বাধা দিন। বাধাদেবার ফলে শিশু রেগে যেতে পারে। তারপরও তাকে একই জিনিস আনার জন্য আবার নির্দেশ দিন। এখানে নির্দেশ মতো কাজ না করার কারণে শিশু যে ভুল আচরন করতে যাচ্ছিল সেটাকে বাধা দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে যদি তার শেখানো বন্ধ করে দেয়া হয়, তাহলে সে শিখবে যে রাগ করলে আর কাজটি করতে হবে না। অনেকগুলো বস্তুর মধ্যে পার্থক্যকরণ শেখানোর জন্য এই বাধা দান খুবই কার্যকরী কৌশল।

জ)বিভিন্ন পরিস্থিতিতে দক্ষতার ব্যবহার ঃ অনেক শিশুর ক্ষেত্রে একটি সমস্যা দেখা যায়, তা হলো কোন পরিস্থিতিতে একটি দক্ষতা শেখানো হলে তা একই রকম অন্য পরিস্থিতিতে ব্যবহার করতে পারে না। বিভিন্ন পরিস্থিতে দক্ষতার ব্যবহার করানোর জন্যঃ

- শিশুকে উৎসাহিত করুন এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিকে নতুন দক্ষতা ব্যবহার করার জন্য নির্দেশ দিন।
- শিশুকে পুরষ্কার দিন যতক্ষণ না পর্যন্ত শিশু শেখানো দক্ষতা ব্যবহার করতে পারে।

উপরোক্ত কৌশল গুলো যেটি শিশুর জন্য প্রযোজ্য তা বুঝে প্রয়োগ করুন।

শিশুর দড়্গতা উন্নয়নে অভিভাবকের করণীয় ঃ

সামাজিক বিকাশের জন্য করণীয়ঃ

শিশুর অন্যান্য সামাজিক আচরন যেমনঃ হাসির জবাবে হাসতে পারা, সালাম করা, করমর্দন করা, আনন্দ প্রকাশ করা, শারিরীক স্পর্শ দ্বারা বন্ধুত্ব করা ইত্যাদি এসব দক্ষতগুলোও উপরোক্ত কৌশল গুলো প্রয়োগ করে শেখান।এছাড়াও ঃ

- শিশুকে সকল ধরনের সামাজিক পরিবেশে নিয়ে যান। যেমনঃ আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীদের বাসায়, সামাজিক অনুষ্ঠানে, খেলার মাঠে, পার্কে, শপিং-এ ইত্যাদি। এই ধরনের পরিবেশের সাথে শিশুকে খাপ খাওয়াতে সাহায্য করুন। শিশুকে সকল ধরনের সহযোগীতা ও সমর্থন দিন এবং অন্যের বিরূপ সমালোচনা ও আচরন থেকে শিশুকে রক্ষা করুন।
- শিশুর সাথে নিজেরা নিয়ম করে খেলবেন।যেমন:বল ছোড়া ও ধরা, লুকোচুরি খেলা ইত্যাদি।
- সমবয়সীদের সাথে মিশতে দিন এবং খেলার মাঠে সবার সাথে খেলার জন্য শিশুকে উৎসাহিত করুন।

- খেলার মাঠে, পার্কে ঘুরতে নিয়ে যান ও সহজভাবে চলাফেরা করতে দিন।কোথাও বেড়াতে নিয়ে গেলে এবং আত্মীয় স্বজন বিরক্ত হলে, শিশুর সমস্যার ব্যাপারে খোলামেলা হোন তাহলে সব অস্বস্তি কাটিয়ে ওঠা যাবে।

আত্মনির্ভরশীলতার বিকাশ এর জন্য করণীয়ঃ

- শিশুর বয়স ও বুদ্ধি অনুযায়ী যে সব দক্ষতা এখনো শিখতে পারেনি সেগুলোই হবে শেখানোর বিষয়।যেমনঃ যথাস্থানে প্রসাব-পায়খানা করা, নিজ হাতে খাওয়া, হাত-মুখ ধোওয়া, দাত মাজা, গোসল করা, চুল আচড়ানো, জামা জুতা পরা, পেনসিল-কলম দিয়ে লেখা ইত্যাদি দরকারী জিনিসগুলো ব্যবহার করতে পারা।
- কাজগুলো ছোট ছোট ভাগ করে শেখান। শিশু কোন কাজ শুরু করতে না চাইলে তাকে তার কাজ পছন্দ করার সুযোগ দিন এবং তার পছন্দ অনুযায়ী কাজগুলো শেখান।
- শিশুর পছন্দ ও অপছন্দকে হ্যাঁ/না বলে বা ইঙ্গিত দ্বারা প্রকাশ করতে শেখান।
- কোন কিছু শেখার ক্ষেত্রে শিশু যদি সঠিক কাজটি করতে পারে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে পুরষ্কার দিন এবং যদি শিশু চেষ্টা করে তাহলেও তাকে চেষ্টা করার জন্য পুরষ্কার দিন।

ভাষার বিকাশ এর জন্য করণীয় :

১. যদি শিশুর ভাষা খুব কম থাকে তাহলে তার সাথে বেশী বেশী করে কথা বলুন, যাতে ভাষার উন্নতি হয়। এক্ষেত্রে:

ক) প্রতিদিন রুটিন করে শেখানো কথাগুলো বার বার বলানোর অভ্যাস করুন ও তার সাথে নতুন শব্দ শেখানোর চেষ্টা করুন।

খ) শিশু অস্পষ্ট ভাবে কোন শব্দ উচ্চারণ করলে তাকে সম্পূর্ণ শব্দে পরিণত করতে চেষ্টা করুন।

গ) শিশুকে আপনার চোখের দিকে তাকাতে ও ঠোঁটের নাড়াচাড়া অনুসরণ করতে সাহায্য করুন।

ঘ) প্রাথমিকভাবে দরকারী সহজ ও ছোট শব্দ শেখান। সেগুলো স্পষ্ট ও ধীরে ধীরে উচ্চারণ করে শেখান।

২. যেসব শিশুর ক্ষেত্রে একেবারেই ভাষার বিকাশ অনুপস্থিত।সেক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি চর্চা করানো যেতে পারে ঃ

- আমরা মনের কথা ও প্রয়োজন বুঝানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের ভাষা ব্যবহার করি,সাথে সাথে অনেক ধরনের অঙ্গভঙ্গিও করি। যেমনঃ চোখের ইশারা, মাথা নাড়ানো, হাত দিয়ে নির্দেশ করা, মুখ গোমড়া করা বা মুখ হাসি হাসি রাখা ইত্যাদি। এই অঙ্গভঙ্গি ও আমাদের মনের ভাব প্রকাশের জন্য এক ধরনের ভাষা।তাই শিশুকে ইশারা, ইংগিতের মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করতে শেখান ও উৎসাহিত করুন।

৩. যেসব শিশুর যথাযথ ভাষার দক্ষতা রয়েছে কিন্তু বাসায় বা সামাজিক পরিবেশে ব্যবহার করতে চায় না। সেক্ষেত্রে-

অভিনয় করে দেখান,উৎসাহ দিন ও পুরষ্কার ব্যবহার করুন যাতে শিশু সামাজিক পরিবেশে তার ভাষা ব্যবহার করতে পারে।যেমন- একজন বিস্কিট বলতে পারে কিন্তু প্রয়োজনের সময় বিস্কিট চাইছে না। এক্ষেত্রে যখন সে নিজের মুখে বিস্কিট চাইবে তখনই তাকে বিস্কিট দিন, তার আগে নয়। এভাবে করলে শিশু তার প্রয়োজন ধীরে ধীরে প্রকাশ করতে শিখবে।

৪. ছবির বই, জিনিসপত্র দেখিয়ে কথা শেখান। শিশুকে অক্ষর ও ছাড়া গানের ক্যাসেট শোনাতে পারেন।

৫. শিশুর ভাষা থাকুক বা না থাকুক তার চারপাশের জিনিস পত্রগুলোর নাম স্পষ্ট করে তাকে বলতে হবে।

জেদী আচরন এবং নিজেকে আঘাত করার প্রবণতাঃ এই শিশুদের অনেকেই পরিবেশের পরিবর্তন মেনে নিতে পারেনা। যদি কেউ পরিবারের সুবিধার জন্য বা শিশুর সুবিধার জন্য রুটিন বা অভ্যাসের মধ্যে কোন কিছু পরিবর্তন করতে চায় তাহলে কখনো কখনো এসব শিশু হতাশ হয়, ভয় পায় বা খুব রাগান্বিত হয়ে উঠে। তারা বুঝতেই পারেনা তাদের এই আচরন অন্যদের উপর কি ধরনের প্রভাব ফেলবে।

হতাশ হয়ে পড়লে বা রেগে গেলে শিশু ভাংচুর করতে পারে, নিজেকে আঘাত করতে পারে, যেমন: দেয়ালে মাথা ঠুকা, চুল টেনে তুলে ফেলা, নিজের হাত কামড়ানো ইত্যাদি। নিজেকে আঘাত করার প্রবণতা কিছু শিশুর ক্ষেত্রে আনন্দদায়ক হয়। তবে কিছু শিশু অনেক বেশি বয়সে অন্যের ইশারা কিছুটা বুঝতে পারে এবং তখন কিছুটা হলেও তাদের জীবণ যাত্রা সহজ হয়।

- এসব আচরণের ক্ষেত্রে কিভাবে আচরণগুলো ঘটছে যেমন: পূর্ববর্তী করণ আচরণ ফলাফল তার বিশ্লেষণ করুন। প্রয়োজনে এগুলি লিখে রাখুন ও চিকিৎসক পরমার্শককে দেখিয়ে সাহায্য নিন।
- কোন শব্দ, আলো, গন্ধ ইত্যাদির প্রতি অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া (কানে হাত দিয়ে রাখা, চোখ বন্ধ করে ফেলা, চিৎকার করা ইত্যাদি) করলে শিশুকে ঐ ধরনের পরিবেশ থেকে দূরে সরিয়ে রাখুন।
- শিশুর ভুল কাজ ও অযৌক্তিক আচরন সমর্থন করবেন না। জেদী আচরন বন্ধ করলে পুনরায় শিশুর দিকে মনোযোগ দিন।
- শিশুর সাথে কোন রকম বকাঝকা, ভয় দেখানো, মারধোর বা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করবেন না।
- পরিবেশের কোন পরিবর্তনে যদি শিশু আক্রমনাত্মক হয়ে ওঠে তাহলে প্রশিক্ষণ ও পুরষ্কার দেবার মাধ্যমে ঐ পরিবেশের সাথে ধীরে ধীরে অভ্যাস্ত হতে শেখান।

অতি চাঞ্চল্য ঃ এই শিশুদের যেহেতু সামাজিক যোগাযোগ ও আচরনগত সমস্যা থাকে তাই সাধারণ মানুষের মতো তারা অন্যদের সাথে মিশতে ও খেলতে পারে না, এ কারণে তাদের শক্তি খুব কম ক্ষয় হয়। এসব কারণেও তাদের মধ্যে অতিরিক্ত চঞ্চলতা দেখা যায়। তাই শিশুকে বিভিন্ন ধরনের কাজের মাধ্যমে

শান্ত হতে শেখান যেমনঃ গান শোনা, সাতার কাটা, টিভি দেখা, বিভিন্ন খেলনা দিয়ে বিভিন্নভাবে খেলা ইত্যাদি।তেমনই পাশাপাশি অবসর কাটানোর প্রক্রিয়াও শেখান। সাথে সাথে তাদের খাদ্যাভাসের তালিকাও তৈরী করা বাঞ্চনীয়। যাদের মধ্যে অতিরিক্ত চঞ্চলতা আছে তাদের খাদ্য তালিকায় বেশী শক্তি যুক্ত খাবার যেমনঃ ফাস্টফুড, চিপস, জুস, কোল্ড ড্রিংকস, তেলেভাজা খাবার ইত্যাদির আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে এসব নিয়ন্ত্রণ করে বাসায় তৈরী স্বাভাবিক ও সুষম খাবার খাওয়ানোর অভ্যাস করুন। যদি শিশুর মধ্যে খুব বেশী পরিমান চাঞ্চলতা দেখা যায় তাহলে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিন।

বিনোদন মূলক কাজের প্রশিক্ষণ ঃ

- কিছু শিশু রয়েছে যারা সব সময় বাইরে বেড়াতে যেতে চায়, এজন্য জেদ এবং অপ্রত্যাশিত আচরণ করে। এসব শিশুকে বাসার টিভি দেখতে দিন, গান শুনতে, ছবি আঁকতে ও তার পছন্দের কোন কাজ করতে উৎসাহ দিন।
- কিছু শিশু রয়েছে যারা সারাক্ষণ টিভি দেখতে চায় এবং অন্যান্য কাজ করতে চায় না বা বাইরে যেতে চায়না, তাদের বাইরে বেড়াতে যেতে উৎসাহিত করুন।

বিশেষ দক্ষতা ঃ এই শিশুদের মধ্যে অনেককেই কোন কিছুর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে দেখা যায়, যেমন:খেলনা বা ইলেকট্রনিক্স জিনিস খুলতে পারা, কোন কিছু চট করে মুখস্থ করার ক্ষমতা ইত্যাদি। শিশুর এসব আচরনকে দক্ষতা হিসেবে দেখুন এবং প্রশিক্ষণ ও সমর্থন দিয়ে এসব দক্ষতাকে কাজে লাগান। যেমন: যাদের ছবি আঁকা বা ছবি দেখার প্রতি অতিরিক্ত আগ্রহ আছে তাদেরকে ছবির মাধ্যমে নতুন কিছু শেখানো যায়। আবার যদি কারও খেলনার (যেমন: পুতুল, গড়ি ইত্যাদি) প্রতি আগ্রহ থাকে তাহলে সেটা অংক শেখা বা ভাষার বিকাশের ক্ষেত্রে ব্যবহার করুন। যেমন: দুইটা/ ৩টা পুতুল একসাথে করে জিজ্ঞেসা করা এখানে কয়টা পুতুল রয়েছে ইত্যাদি।

শিশুরা কতোটুকু কাজকর্ম করতে পারবে ঃ

অটিজম রোগটি মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের মধ্যে বেশী দেখা যায়। বিদেশী একটি গবেষণায় দেখা গেছে ১০০০ জনের মধ্যে ৬ জনের অটিজম রয়েছে (Newschaffer et al. 2007)। বাংলাদেশে ৩,৫৬৪ জন শিশুর উপর একটি গবেষণায় দেখা যায় ০.৮% শিশুর অটিজম রয়েছে(Rabbani MG et al. 2009) । বিদেশী আরেকটি গবেষণায় দেখা গেছে ৪% অটিজম এর শিশু সাধারণ মানুষের মতো কাজকর্ম করতে পারে।

১। যেসব শিশুর অল্পমাত্রার অটিজম রয়েছে তাদেরকে নিজের কাজ করতে শেখালে, স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে পারবে।

২। যাদের স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তা রয়েছে তারা কিছুটা অন্যের সাহায্য নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাজ করতে পারবে। যেমন: কম্পিউটারে তথ্য প্রবেশ করানো, ব্লক, বিক্রয়কর্মী, ফ্যাক্টরীর কাজ, ছোটখাট ব্যবসা ইত্যাদি কাজ করতে পারবে।

৩। যাদের বুদ্ধিমত্তা কম তারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অন্যের সাহায্য নিয়ে ও কাজ করতে পারে না, তাদেরকে শুধুমাত্র নিজের কাজ গুলো করার জন্য প্রশিক্ষণ দিন।

৪। লেখাপড়াটা বুদ্ধিমত্তা এবং যোগাযোগের দক্ষতার উপর নির্ভর করে। তাই স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তা থাকলেও যাদের যোগাযোগের দক্ষতা কম, তারা বেশী দূর পর্যন্ত পড়তে পারে না।

৫। যাদের অটিজমের মাত্রা মাঝামাঝি পর্যায়ে রয়েছে তারা কিছুটা অন্যের সাহায্য নিয়ে নিজের কাজ করতে পারে।

৬। যাদের অটিজমের মাত্রা গুরুতর পর্যায়ে রয়েছে তাদেরকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য অন্যের উপর নির্ভর করতে হয়।

৭। প্রতিভাবান বা বিশেষ মেধা সম্পন্ন বা তীক্ষ্ম বুদ্ধি সম্পন্ন এই শিশুরা তাদের পছন্দের বিষয়ে অনেক দক্ষতা অর্জন করতে পারে।যেমন: ছবি আকা, অংক শাস্ত্র ইত্যাদি।

শিশুকে উপরোক্ত বিষয়গুলো শেখানোর সাধারণ কিছু নিয়ম:

- শেখানোর সময় দীর্ঘ সময় না হয়ে অল্প সময় হওয়া ভালো। শিশুদের জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে ১০মিনিট সময় যথেষ্ট।এরপর ধীরে ধীরে শেখানোর সময় বাড়ানো যেতে পারে।
- শেখানোর সময় এমন বিষয় বাছাই করবেন এবং এমনভাবে চেষ্টা করবেন যাতে শিশু সেটা করতে সফল হয়।
- এক সাথে অনেক গুলো বিষয় শেখানোর চেষ্টা করা উচিত নয়।
- শেখানোর সময় শিশুর আগ্রহ, ইচ্ছা ও পছন্দকে গুরুত্ব দিন, ইতিবাচক মনোভাব দেখান। শিশুর ব্যর্থতার জন্য ধৈর্য্য হারাবেন না।
- শেখানোর সময় বাড়ির নির্দিষ্ট কিছু স্থানে শিশুর পছন্দণীয় পরিবেশ বজায় রাখুন।
- শিশুকে শেখানোর সময় তার সম্পর্কে লিখে রাখুন। এতে বোঝা যাবে শিশু কতটুকু শিখতে পারছে ।

সংশিস্নষ্ট অন্যান্য রোগের চিকিৎসা

- অটিজম এর শিশুদের কারও কারও মধ্যে একই সাথে অন্যান্য রোগ যেমন: মানসিক প্রতিবন্ধিকতা, খিঁচুনি, মৃগী ইত্যাদি দেখা যায়। সে কারণে এসব শিশুর জীবন আরও কঠিন হয়ে উঠে। এই সমস্যা গুলো থাকলে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

- অন্যান্য সাধারণ শিশুর মতো এই শিশুরা নিজেদের অসুখ বিসুখের কথা বলতে পারে না। সেজন্য শিশুর স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ খেয়াল রাখুন। তেমন কোন অসুখের লক্ষণ দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

অভিভাবকের নিজের জন্য করণীয়ঃ

১। অভিভাবকেরা পরিবার এবং শিশুকে নিয়ে বেশ মানসিক চাপে থাকেন।তাই নিজের যত্ন নিন এবং নিজের জন্য কিছুটা সময় রাখুন।প্রয়োজনে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে কথা বলুন এবং তাদের সহযোগিতা গ্রহন করুন।

২। উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা বোধ করলে শীথিলকরণ/আরামকরণ/রিলাক্স পদ্ধতি ব্যবহার করুন, এজন্য নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করুন-

ক) নিজের রুমে অথবা শান্ত পরিবেশে আরাম করে বসুন।

খ) ধীরে ধীরে চোখ বন্ধ করুন।আপনার নিঃশ্বাসটাকে অনুভব করার চেষ্টা করুন।

গ) লম্বা করে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিন (৪-৫ সেকেন্ড সময় ধরে)। নিঃশ্বাসটা কিছুক্ষন(৫ সেকেন্ড সময় ধরে) বুকের মধ্যে ধরে রাখুন।এরপর আস্তে আস্তে ঠোটের ফাক দিয়ে নিঃশ্বাসটা ছেড়ে দিন(৭-১০ সেকেন্ড সময় ধরে)।

ঘ) নিঃশ্বাস ছাড়ার সাথে সাথে মনে মনে বলতে থাকুন "আমার ভিতরের সব ক্লান্তি,দুঃখ,কষ্ট বের হয়ে যচ্ছে। আমি আরাম বোধ করছি"। এসময় সম্পূর্ণ শরীরকে ছেড়ে দিন এবং নিঃশ্বাসের প্রতি মনোযোগ দিন।

এর মাধ্যমে মন ও শরীরে আরাম বোধ করবেন।এছাড়াও মন খারাপ,মাথা ব্যাথা,অনিদ্রা,খারাপ কোন কিছু ঘটার দুশ্চিন্তা,মনোযোগে সমস্যা কমানোর জন্য এবং আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্য এই পদ্ধতি অনুসরন করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়।

৩। অন্যান্য যে সব পরিবারের শিশুর অটিজম বা এই ধরনের অন্য কোন সমস্যা রয়েছে, তাদের সাথে কথা বলুন।তাদের সাথে বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা আলোচনা করুন।যা আপনার মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করবে।

৪। নিজে অথবা পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা অতিরিক্ত মানসিক চাপ বোধ করলে; ব্যক্তিগত কাউন্সেলিং অথবা পারিবারিক কাউন্সেলিং গ্রহণ করুন।

৫। স্বাভাবিক শিশুর তুলনায় অটিজম এর শিশুদের নতুন আচরণ শিখতে অনেক বেশী সময়ের প্রয়োজন হয়।তাই "শিশু কেন আরো ভালো করছে না" এটা চিন্তা করে স্কুল, শিক্ষক কিংবা সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের উপর চাপ সৃষ্টি করবেন না।বরং নির্দিষ্ট বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা করে বিষয়টি বুঝতে চেষ্টা করুন।

শেষ কথা

শিশুর যতদ্রুত চিকিৎসা শুরু করা যাবে ততো ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। একই সঙ্গে মানসিক ও সামাজিক সহযোগীতা জরুরী। অনেক বাধা বিপত্তির মধ্যেও শিশুর আচরণকে সহজভাবে গ্রহণ করুন। বয়স বাড়ার সাথে সাথে অনেক শিশুই নতুন আচরণ যেমন ভাবে শেখে, তেমনিভাবে তাদের মধ্যে নতুন সমস্যাগ্রস্থ আচরণও দেখা যায়। শিশুর আচরণ পরিবর্তনের জন্য যথাযথ কৌশল প্রয়োগ করা হচ্ছে কিনা, তার উপর নির্ভর করে শিশুর আচরণ কতটুকু নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। শিশুকে শেখানোর ব্যাপারে বাবা-মা, ভাই-বোন ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা তাদের সঙ্গে সব সময় গঠনমূলক ও সহানুভূতিশীল আচরণ করুন। শিশুর জন্য স্নেহ-মমতাময় ঘরের পরিবেশ গড়ে তুলুন। কুসংস্কার, ভুল ও অসম্পূর্ণ তথ্য থেকে দূরে থাকুন,সঠিক তথ্য জানুন এবং তার যথার্থ প্রয়োগের চেষ্টা করুন।

This is a part of MPhil research (in 2013) carried out by by Jesan ara, supervised by Kamal Uddin Ahamed Chowdhury, Associate Professor, Department of Clinical Psychology, University of Dhaka.
Jesan ara, Assistant Professor and Clinical Psychologist, Department of Psychology, Rajshahi University. <jesan53006@gmail.com>